দেখে এলাম পটুয়াদের গ্রাম – আমাডুবি

উদ্ভাসের ওয়েব-ম্যাগাজিনে এবার ভ্রমণকাহিনি। সন্ধিনী রায়চৌধুরী-র কলমে উঠে এল আমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য গ্রামের মধ্যেই একটি একটু অন্যরকম গ্রামের কথা, যেখানকার জীবনযাপন ও শিল্পযাপন অবিচ্ছেদ্য। পটচিত্রের সঙ্গে যেখানে সংগীতকে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের জীবনের অংশ হিসাবে।

হিমেল হাওয়ার চাদর সরিয়ে মিঠে রোদের আবেশে ঋতুরাজ বসন্তের আগমনবার্তা যখন প্রকৃতির আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে তখনই অর্থাৎ ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬-র সকাল সকাল একটা কোয়ালিশ গাড়ি ভাড়া করে আমরা আপনজনেরা কয়েকজন মিলে রওনা দিলাম আমাডুবির উদ্দেশ্যে। আমাদের যাত্রা শুরু হল পৈতৃক ভিটে 'সুবর্ণশিলা' (ঘাটশিলা) থেকে। গাড়ির আরোহীরা প্রত্যেকেই জীবনের প্রান্তিক সীমায় পৌঁছে যাওয়া কিন্তু উৎসাহ আর উদ্দীপনায় সকলের মনেই নবীনতার ছোঁয়া। লালমাটির মহুয়া-মাতাল গন্ধে মাতোয়ারা শাল-পিয়াল-সোনাঝুরির সবুজ সান্নিধ্যে আমরা ছুটে চলেছি আরেক ছুটির ঠিকানায়। শাল-পিয়াল-সোনাঝুরির ফাঁকে ফাঁকে শিমূল-পলাশ-কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়ায় রং-এর মাতামাতি দেখে মনে হল বনে বনে আগুন লেগেছে। গানের কলি মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠলো – 'ও শিমূলবন, দাও রাঙিয়ে মন। / কৃষ্ণচূড়া দোপাটি আর পলাশ দিল ডাক।' এ যেন চারিদিকের টিলা পাহাড়ের উন্মুক্ত সবুজ ঢেউ-এ, আকাশের নীলিমায় এক টুকরো জীবন আর যৌবনকে হারিয়ে খোঁজা।

বেশ খানিকটা পথ চলার পর মোরাম বিছানো দূরগ্রামের মেঠো বাড়ীর নিরানো দেওয়াল আর ছোট ছোট সবুজ পাহাড়ের হাতছানি দেখে বুঝলাম ধলভূমগড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি। অদ্ভুত মাদকতায় ভরা গোটা প্রকৃতি ঘিরে আছে গ্রামটাকে। অনুর্বর মাটিতে কোথাও বা আল বেঁধে জল দিয়ে চাষাবাদের চেষ্টা করছে আদিবাসী গ্রামের মানুষেরা। ছোটো ছোটো সবকটি বাড়িই লাল রং করা মাটির দেওয়াল আর খড়-পাতার ছাউনি দেওয়া। দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু কোথাও কোন মালিন্য নেই। সরল গ্রাম্য জীবনে ওরা মাদল বাজিয়ে নাচে, গান করে আবার মহুয়ার নেশায় মাতে। শাল, সেগুনের ভীড়ে ধলভূমগড়ের প্রকৃতি সজীব ও সুন্দর। আদিবাসিদের বসতি, তাদের রোজ-নামচা সিংভূমের এই পাহাড়ি অধিত্যকাকে আরো সাজিয়ে তুলেছে

কারণ এখানে এলেই যেন দূরাগত ধামসা-মাদলের বোল কানে বাজে আর চোখের সামনে ভেসে ওঠে রুক্ষ্ম মাটির বুক চিরে মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজে সাঁওতালিদের সেই সারিবদ্ধ নাচ। বনান্তে আরো সবুজের মিছিলে পথ কেটে চলতে চলতে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাডুবির সবুজ রূপতীর্থে।

জামসেদপুর থেকে আমাডুবি গ্রামের দূরত্ব ৬৫ কিলোমিটার আর ঘাটশিলা থেকে ২০ কিলোমিটার। আমাডুবি হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার ব্লক ধলভূমগড়ে অবস্থিত পট ও পটুয়াদের পীঠস্থান। ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় এই প্রকল্পটি অচিরেই একটি সবুজ রূপতীর্থে পরিণত হয়ে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠবে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই কারণ ঝাড়খণ্ডের রাজ্যসরকারের সৌজন্যে ভারতীয় পর্যটন বিভাগের তৎপরতায় আমাডুবি ক্রমোন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সৌরালোকের ব্যবস্থাদি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে আর ইলেকট্রিক আলো তো আছেই। আমাডুবি একদিক দিয়ে যেমন সবুজ প্রকৃতির আশীর্বাদধন্য তেমনি আবার সুর-তাল-লয়-ছন্দের সমন্বয় সমৃদ্ধ কারণ এখানকার বাসিন্দা সাঁওতাল, মুন্ডা ও অন্যান্য প্রজাতির আদিবাসীদের রক্তে মিশে আছে নাচ আর গান। এখানে সারা বছর ধরেই চলে ঋতু-উৎসবের সমারোহ। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পটুয়ারা আঁকেন পটচিত্র, রচনা করেন গান।

আমাডুবি গ্রামে আনুমানিক সাতচল্লিশ ঘর পটুয়ার বসবাস আর সাঁওতালরা আছেন ঊনসত্তর ঘরেরও কিছু বেশি। এখানকার পটুয়ারা চিত্রকর বলেই পরিচিত। ধলভূমগড়ের গ্রামীন মেঠো লাল মোরামের পথ ধরে আমাডুবি গ্রামে ঢোকার মুখেই চোখে পড়েছে মাটির ঘরগুলি আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতায় শুধু নিকানোই নয়, প্রতিটি ঘরের দেওয়াল প্রাকৃতিক রং-এর উপকরণ দিয়ে চিত্রিত করে দৃষ্টিনন্দন শিল্পনৈপুন্যের স্বাক্ষর রেখেছেন চিত্রকরেরা। শাল-মহুয়া-পিয়াল-শিশুগাছের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথে পরিক্রমার সময় শান্তিনিকেতনের খোয়াই-এর কথা মনে পড়ছিল। কোলাহলহীন শান্ত নির্জন পরিবেশের স্নিগ্ধতায় মনপ্রাণ যেমন ভরে ওঠে তেমনি মনোরম প্রাকৃতিক শোভায় শরীরও হয়ে ওঠে তরতাজা।

পটের বিষয় হচ্ছে মুখ্যত হিন্দু দেবদেবী, পৌরাণিক চরিত্র, দৈনন্দিন জীবনের নানা মুহূর্ত এবং সমাজের বাবু বা ভণ্ডদের নিয়ে ব্যঙ্গদৃশ্য। গল্প-নির্ভর জড়ানো পটের বিষয়গুলি হল সহজ-সরল বাঙালি জীবনের প্রেম-বাৎসল্য, ভক্তি ও আত্মত্যাগের কাহিনি। পটুয়ারা হিন্দু দেবদেবীর পৌরাণিক ও লৌকিক চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেগঞ্জে দেবদেবীর

মহিমাকীর্তন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এরা হিন্দু নাম গ্রহণ করেন, মহিলারা হিন্দু নারীর মত শাঁখা-সিঁদুর পরেন কিন্তু এঁরা হিন্দু সমাজভুক্ত নন। একমাত্র নিজেদের মধ্যেই এঁদের বিবাহ সীমাবদ্ধ। বিয়েটা হয় মুসলমান প্রথা অনুসারে, কিন্তু বৃহত্তর মুসলমান সমাজেও এঁদের কোন স্থান নেই। নিজেদের সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এঁদের আবদ্ধ থাকতে হলেও হিন্দু সমাজেরই মনোরঞ্জন করে এঁদের জীবনযাপন করতে হয় বলে চিত্রাঙ্কনে হিন্দু উপকরণ গ্রহণ করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন।

পট যেন আঁকা নয়, লেখা হয়; কারণ চিত্রলেখার ভিতর দিয়েই একটা কাহিনিকে কাপড় ও কাগজের উপরে রং-তুলিতে ফুটিয়ে তোলাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাকৃতিক উপকরণ থেকে রং-আঠা ইত্যাদি সংগ্রহ করে নারকোলমালাতে গোলা হয়। কাঠবেড়ালি বা বেজির লোম, বাচ্চা ছাগলের ঘাড়ের লোম, বাবুই পাখির পাখার কঞ্চিতে বেঁধে তুলি প্রস্তুত করা হয়। কাপড় কিংবা তুলট্ বা সাধারণ কাগজের ফালি একত্রিত করে একের পর এক তালি মেরে পটের ভূমি তৈরি হয়। সেলাই করে কিংবা আঠা লাগিয়ে কাজটি সম্পন্ন হয়। কাপড়ের ক্ষেত্রে তার উপর পাতলা কাদার প্রলেপ দিয়ে চক-খড়ির আবরণ দেওয়া হয়। কাগজের ক্ষেত্রে পেছনে লম্বা করে পটির দুধারে কাপড়ের পাড় চিটিয়ে দেওয়া হয় যাতে পটটি খোলা বা গোটানোর সময় পটের কাগজে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। এরপর সামনের দিকে রঙের প্রলেপ প্রাথমিকভাবে দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। ছোটো ছোটো নক্সা খোপে খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে বলিষ্ঠ রেখার টানে সাজানো হয়। কত কম রেখায় ও রঙে জড়ানো পটগুলি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে তা না দেখলে বোঝা যাবে না। পট আঁকা হয়ে গেলে অনেকসময়ে শিশিরে ভিজিয়ে নিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এতে নাকি রঙের উজ্জ্বলতা বাড়ে।

সংগীত-কাহিনির উপর ভিত্তি করেই পটের দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হয়। সাধারণত আট-দশ থেকে কুড়ি-পঁচিশ হাতও হতে পারে লম্বায় এবং চওড়ায় দেড় থেকে দুই ফুট। পটের দুপ্রান্তে লাঠি থাকে। প্রান্তভাগ থেকে পটটি গুটিয়ে রাখা হয়। তারপর জড়ানো পটগুলি ঝোলায় ভরে পটুয়ারা গান গেয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়ে। এ যেন অনন্তের পথে যাত্রা।

চিত্রাঙ্কন ছাড়াও পটুয়ারা আরো যে দুই-একটি বৃত্তি পালন করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিষবেদে কিংবা সাপুড়ের ব্যবসা। কারণ সাপুড়েরাও তো একরকম গীতি-ব্যবসায়ী। তারা গান গেয়েই সাপের খেলা দেখিয়ে থাকে আর পটুয়ারা পট এঁকে গানের ভিতর দিয়ে তার ব্যাখ্যা করে। সাপের দেবী মনসার বৃত্তান্ত চিত্রের ভিতর দিয়ে প্রদর্শন করাই সম্ভবতঃ তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলেই পটচিত্রে মনসামঙ্গলের বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কালক্রমে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শিব-পার্বতী, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গলীলা ইত্যাদিও পটচিত্রে স্থান করে নিয়েছে বটে তবুও মনসার কাহিনি তাদের প্রিয়

বলেই বোধকরি জীবনযাপনের জন্য জীবিকার সন্ধানে পটুয়ারা সহজেই সাপুড়ের ব্যবসা গ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়া কণ্ঠে যেহেতু পটুয়াদের গান আছে তাঁরা 'গায়েন' হিসাবেও উপার্জন করেন। তবে সাপুড়ের বৃত্তি পটুয়াদের কৌলিক বৃত্তি বলে কেউ কেউ সাপ খেলা দেখায়। হাঁড়ি, ঘট, পিঁড়ি চিত্রিত করে, টিনের লম্ফ তৈরি করে আবার কেউ বা দিনমজুর খাটে। এই হল পটুয়াদের বংশ পরম্পরায় জীবন নির্বাহের কাহিনি।

পটুয়াদের পাশাপাশি আমাডুবি গ্রামে আদিবাসী নারীপুরুষ যে যার কাজে ব্যস্ত থাকে কিন্তু নাচ আর গান ওদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে – প্রায় রক্তে মিশে থাকার মত। সারাবছর ধরেই নানা ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সাঁওতাল ও মুণ্ডা উপজাতির সঙ্গে অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীও একজোট হয়ে সারিবদ্ধ নৃত্য ও গীতির মূর্ছনায় গ্রামের সমস্ত আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। অন্যদিকে উৎসবগুলিকে উপলক্ষ করে ধামসা মাদল, মন্দার, নাগারা-বাঁশি, ঢাক-ঢোলের তালে তালে ছন্দের মেলবন্ধনে প্রকৃতিও তার সাজ বদলায়। ঋতুতে ঋতুতে নতুন ফুল ও ফসলের পসরা নিয়ে আসেন ধরিত্রীদেবী। বিকশিত তরুলতা, পুষ্পে-পল্লবে সেইসময় সাঁওতালপল্লীর মাঠ-ঘাট-আঙিনা ছেয়ে যায়। গন্ধে ভরে ওঠে দশদিক। শাল-মহুয়ার মিষ্টি গন্ধের আমেজ নিয়ে আমাডুবিতে শুরু হয়ে যায় বাহা উৎসব, যার আর এক নাম 'সারুল'।

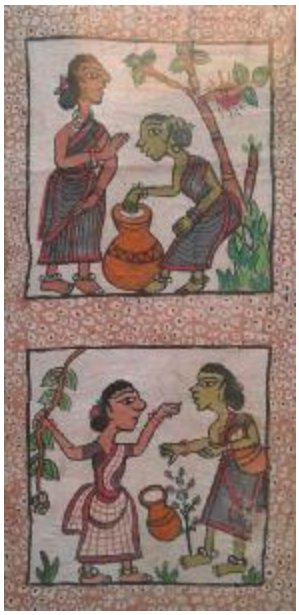

ধলভূমগড়ের অরণ্যভূমি যখন আদিবাসীদের 'বর্ষা উৎসব'-এর করম সংগীতে মুখরিত তখন পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী আমাডুবির কুমারী-কণ্ঠ নিসৃত ভাদু-গানের মধ্যে দিয়ে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বসুন্ধরার বুকে গৃহপালিত পশু তথা বিশেষ করে গো-মাতার পূজার আয়োজন চলে 'মোহরাই'-তে। চৈত্রপরব ও নববর্ষের আবাহনে মরকপরবে আদিবাসীদের নৃত্যগীতির তালে তালে গোটা গ্রাম আনন্দে মাতোয়ারা। টুসুর আবাহনে পল্লীপ্রকৃতি সেজে ওঠে শিমূল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, কুর্চির মতো ফুল ফুটিয়ে। এদের কল্পনায় টুসু গৃহস্থ পরিবারের মানবী মাত্র – দেবী নয়। তাই ওরা গান ধরে :

টুসু সিন্যাছেন গা হিল্যাছেন
হাতে তেলের বাটি
নুয়ে নুয়ে চুল ঝাড়ছেন
গলায় সোনার কাটি।

ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন আদিবাসী যদিও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী তবুও এঁদের মধ্যে যে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠেছে তা বেশ অনুভব করা যায়। সাঁওতালিদের মধ্যে প্রচলিত এক শ্রেণীর গানের নাম 'ঝুমুর'। সাঁওতালি ঝুমুর গানগুলি সংক্ষিপ্ত। কোনো

কোনো সময় তিনটি পদ থাকে, তবে চারটি পদের বেশি প্রায় থাকে না বললেই চলে। ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও ঝুমুরগান কুন্দফুলের মতই সৌরভাকুল কারণ অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেম আর প্রধান অবলম্বন হচ্ছে রূপক। মুন্ডাভাষী সাঁওতাল জাতির মধ্যেই এই গান জনপ্রিয়তার শিখরে।

প্রত্যেক আদিবাসী পল্লীতেই নৃত্যগীতের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকে যাকে 'আখড়া' বলা হয়। পল্লীর যুবক-যুবতীরা এই আখড়ায় সমবেত হয়ে 'আখড়া বান্দিয়া, গুরু, ভালা গীত গাই ...' বলে বন্দনা করে নৃত্যগীতের উদ্যোগ করে। আমাডুবি পর্যটন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ভ্রমণ বিলাসী পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য এই আখড়ার একটি আধুনিক রূপ দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের পারস্পরিক লোকনৃত্য পরিবেশনের জন্য বিশেষ করে এখানে একটি অর্ধাকৃতি স্থায়ী মুক্তমঞ্চ উদার উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলা মাঠে প্রস্তুত করা হয়েছে। মঞ্চের সামনে সিমেন্টে বাঁধানো ধাপে ধাপে কয়েকটি সোপান গ্যালারির মত গাঁথা হয়েছে, যেখানে দর্শকেরা আসন গ্রহণ করে আদিবাসী-নৃত্যগীতি উপভোগ করতে পারবেন। গ্রাম-প্রধানের উদ্যোগে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে আদিবাসীদের উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করে যে পারম্পারিক লোকনৃত্যগুলি এই মঞ্চে পরিবেশিত হয় তার মধ্যে অন্যতম লাঁগড়ে, ডাহর, বাহা, ডাঁসায়, ঝিঙ্কা ইত্যাদি।

পটুয়াদের আবাস, সাঁওতালপল্লী, কচি-কাঁচাদের মুক্ত পাঠশালা, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় – এসব পেরিয়ে পথের প্রান্তে আমরা পৌঁছে গেলাম পর্যটন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে। দুই একর জমি জুড়ে এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রাঙামাটির ক্যানভাসে রকমারি সবুজের প্যাচ। রীতিমত প্লান-পরিকল্পনা মাফিক ইতস্ততঃ রোপিত হয়েছে ভেষজ বৃক্ষাদি; নিরন্তর যত্ন ও পরিচর্যায় কুসুমিত হয়েছে ফুলের বাগিচা। নানা রং-এর মরশুমী ফুলে ছেয়ে থাকা বাগানে মধুর লোভে ভীড় করেছে মৌমাছি। রঙীন পাখা মেলা প্রজাপতিরাও এসে জুটেছে। বিশাল এলাকায় বড় বড় ফলের গাছের সঙ্গে পাম ও অর্কিড-ও আছে বেশ কিছু। এখানকার টুরিস্ট লজে রাত কাটানোর সুবন্দোবস্ত আছে। এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলেও বিদেশী পর্যটকদের ইতস্ততঃ ঘুরতে দেখলাম। এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের লোকজীবনের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। অরণ্যপ্রেমীরাও এসেছিলেন আমাদের মত ঘাটশিলা, গালুডি, জামসেদপুর, ঝাড়গ্রাম ইত্যাদি জায়গা থেকে। সপ্তাহ শেষের দিনটি নির্ভেজাল বিশুদ্ধ বাতাসে প্রকৃতির অপরূপ শোভায় মনপ্রাণ ভরিয়ে নিতে। সারা গায়ে মিঠে রোদ মেখে তারা ছড়িয়ে ছিলেন বিশাল বাগানের আনাচে-কানাচে। কেউ কেউ আবার মাদুর বিছিয়ে মাঠে বসে সঙ্গে আনা খাবার দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে দুপুরের খাওয়া সেরে নিচ্ছিলেন।

গ্রাম-উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান শ্রীকমল গোপ মহাশয় আমাদের সাদরে আহ্বান করে যেখানে এনে বসালেন তা হচ্ছে ফুলের বাগানের মাঝখানে পর্যটন কেন্দ্রের দপ্তরের অদূরে

অবস্থিত বিশ্রামের জন্য নির্মিত একটি সুরম্য গোলঘর, যার কোন দেওয়াল কোথাও নেই। আছে গম্বুজ আকারের খড়ের ছাউনি দেওয়া একটি বৃত্তের মত ছাদ যা মোটা মোটা বেশ কয়েকটি থামের উপর দাঁড়িয়ে আছে। গোল ঘরের চারিপাশ ঘিরে বসবার উপযোগী চওড়া বেদি আছে যার মধ্যে চক্রাকারে গোল হয়ে বসে চারিপাশের মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। ইচ্ছে করলে থামগুলিতে হেলান দিয়ে আরামে গা এলিয়ে দেওয়াও যায়। এরকম একটা পরিবেশে গ্রামপ্রধানের তত্ত্বাবধানে দুটি ঝকঝকে গ্রামের তরুণী সাঁওতাল কন্যা সোনার মতো উজ্জ্বল কাঁসার গ্লাসে মাটির কলসীর ঠান্ডা জল এনে আমাদের হাতে হাতে ধরিয়ে দিল। পথের ক্লান্তি যেন নিমেষে দূর হয়ে শরীর শীতল হল। অতঃপর দেখি কোথা থেকে যেন জনপ্রিয় হিন্দি খবরের কাগজের এক প্রতিনিধি আমরা এসেছি শুনে আমাদের সাক্ষাৎকার নেবার জন্য এসে উপস্থিত। আমাদের মধ্যে সুদূর আমেরিকা, রাজধানী দিল্লী, ঐতিহ্যবাহী মুর্শিদাবাদ আর ঘাটশিলা থেকে আসা আগন্তুকদের দেখেই বোধকরি সাংবাদিক আরো উৎসাহিত হয়েছিলেন। একে একে সাক্ষাৎকার নেওয়া ও ছবি তোলার পর্ব চলল। পরদিন অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারিতে জনপ্রিয় পত্রিকা *প্রভাত খবর*-এ তা ছাপাও হয়েছিল আমাদের ছবিসমেত।

সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ হলে সেই মেয়েদুটিই এলো কাঁসার বড়ো থালার উপর সাধারণ কয়েকটি কাপে চা আর প্লেটে বিস্কুট নিয়ে। স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতায় পরিবেশনার গুণে শুধুমাত্র চা-পানের অভিজ্ঞতার মধ্যে সেদিন যে তৃপ্তির আনন্দ পেয়েছিলাম সে-ও আমার কাছে একটা বড় প্রাপ্তি।

এরপর একটি যুবককে দেখলাম পিঠের ঝোলায় গোটানো পট নিয়ে গোলঘরের ঠিক মাঝখানটিতে বসতে। নাম জিজ্ঞাসা করে জানলাম বিজয় চিত্রকর। এখানকার পটুয়ারা প্রত্যেকেই চিত্রকর। বিজয় একটা বিশেষ ভঙ্গিতে তার ডানদিকের পা ভাঁজ করে বসে বাঁ হাতে পটটি খুলে ইশারায় ইঙ্গিতে পটের চিত্রগুলি গান গেয়ে দর্শকদের দেখাতে লাগল। প্রত্যেক পটুয়াগীতিরই একটা সাধারণ ভূমিকা থাকে যাতে নমস্কার কিংবা ভগবানের নাম স্মরণ করা হয়। যেমন শিব বিষয়ক একটি পট খুলে বিজয় গাইল :

নম মহেশ্বর দিগম্বর ঈশান শঙ্কর।
শিব শম্ভু শূলপাণি হর দিগম্বর॥

বন্দনা থেকেই বোঝা যায় কোনটি কি বিষয়ক পট।

ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে ঘরে ঘরে কুমারীরা একটি মাটির প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে ভাদুর। ভাদুর ছবি আঁকা একটি পট খুলে বিজয় তার আগমনী গান গাইল : ‘আদরিনী ভাদুরানী

এলো আজি ঘরকে'। প্রচলিত জনশ্রুতিতে ভাদু কুমারী তাই পটে আঁকা ছবিতে ভাদুর বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজন প্রসঙ্গে বিজয় গান ধরলো :

ভাদুর বিয়া দিব আজ নিশীথে।
ভাদুর বর আসছে এবার উড়াজাহাজে॥
হলুদ মেখে অঙ্গখানি, বসে আছে চাঁদবদনী,
শুভ লগনে শুভ মিলন আশাতে॥

পটুয়ারা গ্রামে অনুষ্ঠিত উৎসগুলিকে উপলক্ষ্য করে কিংবা বিবিধ গার্হস্থ্য বিষয় অবলম্বন করে যে সব পট আঁকে এবং গান রচনা করে তাতে ধর্মভাবের লেশমাত্র থাকে না। এদিক দিয়ে পটুয়া সংগীতগুলির সঙ্গে আদিবাসী তথা লোকসমাজের যোগ নিবিড়। পটের দিকে তাকিয়ে দেখি প্রাণহীন ছবিগুলি স্থির হয়ে আছে কিন্তু গানের ভিতর দিয়ে সেগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। পট আর গান মিলিয়ে বিষয়টিকে এমন সম্পূর্ণতা দেয় যে নিষ্প্রাণ ছবিগুলি গানের সুরে চঞ্চল হয়ে ওঠে। পটের সঙ্গে গানের এ এক আশ্চর্য সম্মিলন। মকর পরবের পটচিত্রের সঙ্গে বিজয়ের গান :

বলি, ওলো মকর।
আসছে জামাই, নূতন নূতন ফ্যাশন কর॥
সাবান মেখে ফরসা হয়ে লো, রেডি হ'লো তুই সত্বর।
আসছে ঘোড়ায় চেপে নিয়ে যাবেক শ্বশুর ঘর॥

বিজয়ের পটে সমসাময়িক বিষয়ের মধ্যে স্থান পেয়েছে মাছের বিয়ে, আদিবাসী জন্মকথা, সাক্ষরতা অভিযান, পণপ্রথা প্রভৃতি।

বিজয়ের পটচিত্র প্রদর্শনের এক ফাঁকে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে সে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু এঁদের নাম শুনেছে কিনা। ওমনি সে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বলল – ওরা হলেন নমস্য ব্যক্তি। আমার মনে পড়লো ১৯০৭ সালের কাছাকাছি বছরগুলিতে নন্দলাল দেশের প্রাচীন কলাকেন্দ্রগুলি দেখার জন্য ভারতভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তখনই তিনি দেশজোড়া শিল্পের একটি কলাকেন্দ্র থেকে ক্রমান্বয়ে অন্য আর এক কলাকেন্দ্র ঘুরে যখন কলকাতায় ফিরলেন, মেতে উঠলেন কালিঘাটের পট আর লোকশিল্প নিয়ে। পটুয়া নিবারণ ঘোষদের কাছে গিয়ে অতি দ্রুত রেখা ও রঙের কাজে এই শিক্ষাগ্রহণ করলেন। শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রকলাতেও পটচিত্রের আদল পাওয়া যায়। উৎসাহী যুবক বিজয়কে আমার এই জন্য বিশেষ করে ভালো লেগে গেল যে, পটের গান শুনবে এমন শ্রোতার আজ বড় অভাব। কথা ও সুরের টানও একটা বাধা। তাছাড়া চারিপাশের চলমান বিনোদনের চাকচিক্য প্রায় ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। পটুয়া পট দেখিয়ে গান করছে আর লোকে ভীড় জমিয়েছে এ দৃশ্য প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই তো পট বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে চৌকো পট এবং ঘর সাজানোর উপযোগী করে তৈরি হচ্ছে আড়াআড়ি লম্বা পট। তৈরি হচ্ছে অলংকৃত

গয়নার বাক্স, হাতপাখা, ছাতা, কাপ-কুলোর সঙ্গে চিত্রিত কাপড়, চাদর, পোষাক-আসাক। আসল কথা শিল্পীরা বাঁচতে চাইছেন। এই প্রেক্ষিতে বিজয়ের ক্ষেত্রে বাঁচার লড়াইটা ভিন্ন। সে তার বাপ-ঠাকুর্দার বংশপরম্পরায় চলে আসা পটুয়াবৃত্তিকে অবলম্বন করেই পটচিত্রর ঐতিহ্য ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের পথিকৃৎ – যার মধ্যে দিয়ে ভাবীকালেও পটচিত্রর পরম্পরা অক্ষুণ্ন থাকতে পারে তা দেখে আশাবাদী আমি অভিভূত হয়ে ওর কাছ থেকে বেশ কয়েকটি পটচিত্র কেনার পর আশীর্বাদ স্বরূপ কটি টাকা ওর হাতে গুঁজে দিলাম। আবেগে আপ্লুত হয়ে এর প্রতিক্রিয়ায় প্রণাম করে সে তার ঝোলা থেকে একটি পট বার করে আমাকে উপহার দিয়ে বললো – 'আপনার এই অমূল্য আশীর্বাদীর পরিমাপ করার সাধ্য আমার নেই, কিন্তু আপনাকে কিছু দিয়ে আমি ধন্য হতে চাই।' আমার এত বছরের অভিজ্ঞতায় আমি জানি এই বয়সী শহুরে কোনো ছেলের হাতে ওই কটি টাকা দিয়ে বিনিময়ে এ পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসিটুকু আমি কখনই পেতাম না।

চিত্র পরিচিতি : সবগুলিই আমাডুবির পটচিত্র। শিল্পী : পটুয়া বিজয় চিত্রকর।